নদিয়ার ভাষা

দেবাশিস ভৌমিক

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

গ্রন্থনাম 'নদিয়ার ভাষা' বিদগ্ধ পাঠকের কপালে সন্দেহের ভাঁজ ফেলতে পারে। কারণ 'নদিয়ার ভাষা অর্থাৎ নদিয়া জেলার ভাষা তো বাংলাই। তবে আলাদা ভাবে নদিয়ার ভাষা বলতে আদৌ এখানে কী বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ সন্দেহ নিরসন করা নান্দীমুখেই লেখকের পরম কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নদিয়া জেলার ভাষা যে বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবার কথাও নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাংলাভাষার আলাদা এমন কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তার জন্য একটি জেলার কথ্য ভাষাকে মৌলিকভাবে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসলে নদিয়ার কথ্য ভাষা বাংলা—এটি প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত এই কথ্য বাংলা রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত বাংলা। তাছাড়া রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে নদিয়ার কথ্য বাংলায় মিশেছে বঙ্গালী উপভাষা। ফলত রাঢ়ী ও বঙ্গালীর মিশ্রণে এ জেলায় তৈরি হয়েছে এক স্বতন্ত্র ঔপভাষিক মিশ্রণ। সবচাইতে বড়ো কথা নদিয়ার সবিশেষ ভাষাবৈশিষ্ট্য একটু একটু করে গৃহীত হয়েছে মান্যচলিত ভাষাতে। অর্থাৎ মান্যচলিত কথ্য বাংলাভাষা নির্মানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্যতা যে জেলার, সেটি অবশ্যই নদিয়া জেলা। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই জেলার মাটি থেকে উঠে আসা শব্দবন্ধ, বাক্যবিন্যাস, প্রবাদপ্রবচন মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য থেকে শুরু করে অনুসৃত হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ভাষাগত যে নাগরিকতা চোখে পড়ে তার উৎস রয়েছে এই নদিয়ার কথ্যবাংলাতেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী—কে ব্যবহার করেন নি এ জেলার কথ্য বাংলাকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃজন গুলির মধ্যে। সেকারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, নদিয়ার কথ্য ভাষা একটা মান্যতা পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের ভাষায়। তাই একে 'নদিয়ার ভাষা' নামে চিহ্নিত করলে ক্ষতি কি! ইতিহাস বলে, যখনই কোনো জাতি গোষ্ঠী বা দেশ তৈরি হয় তখন ভাষাসৃষ্টির বিক্রিয়াটি তার সমান্তরালে বয়ে চলে। এর জন্য আলাদা প্রযত্ন গ্রহণের কোনো আবশ্যকতা দরকার নয় না। নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী

বা দেশের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কোনো জেলাকে চিহ্নিত করে তার ভাষাকে বা কথন রীতিকে আলাদা করে চিহ্নিত করার বড়ো একটা দরকার পড়ে না। কারণ সুনির্দিষ্ট সেই ভূখন্ডে সম্পূর্ণ আলাদা কোনো ভাষিক ভূখন্ড গড়ে ওঠে না। শুধু অল্পবিস্তর কিছু মৌলিকতা দিয়ে একেকটি এলাকাকে চিহ্নিত করা যায় মাত্র। সেই অর্থে নদিয়া জেলার ভাষা প্রথমত বাংলাভাষা। গ্রীয়ারসন, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এ জেলার ভাষাকে রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে নদিয়ার ভাষা রাঢ়ী উপভাষা। এটি প্রথম কথা।

রাঢ়ী উপভাষার সর্বৈব বৈশিষ্ট্য এ জেলার ভাষিক রীতিতে পরিপূর্ণভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে প্রথমাবধি। তবে অনুমিত হয়, একসময় নদিয়া জেলায় সংস্কৃতই ছিল জীবন্ত মাতৃভাষা। নদিয়া জেলার নানা ইতিহাস থেকে জানা গেছে, এ জেলার ব্রাহ্মণ পন্ডিত বৈদ্য ঘটক, কুলজ সন্তান এবং রাজকর্মচারী প্রত্যেকেই শৈশব থেকে সংস্কৃতভাষা শিখতেন এবং শিষ্ট সমাজে সংস্কৃত ছিল কথ্যভাষা। সেকালের এই সংস্কৃত ভাষা শেখবার জন্য একাধিক টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, উলা, বহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিনী, বিল্বগ্রাম ইত্যাদি স্থানে টোলে ও চতুষ্পাঠী তে ছাত্রদের ভীড় লেগে থাকতো। বিশুদ্ধ বাংলাভাষা তখনও নদিয়া জেলায় প্রচলিত হয় নি। বাংলা লেখার ক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসারী বাংলা লেখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলত একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সংস্কৃত ভাষাই এ জেলার বাংলাভাষাকে লালন ও বর্ধন করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। আর ঠিক সেই কারণেই গোটা বঙ্গদেশের মধ্যে নদিয়াজেলার ভাষা হয়ে উঠেছে অনন্যসুন্দর। কী নেই নদিয়ার ভাষায়! আছে ঐতিহ্য, ভাষিক পরিশুদ্ধতা, ভাবের ঐশ্বর্য, মননের আভিজাত্য, উন্নত হাস্যরস এবং সবার উপরে অসাধারণ শ্রুতিমাধুর্য।

১২০২-এর তুর্কি আক্রমণ নদিয়াজেলার ভাষার উপরে যারপরনাই প্রভাব বিস্তার করলো। বাঙালীর জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর এই ঐতিহাসিক ঘটনা যে বিলোড়ন তুলেছিল, ভাষাও তা থেকে মুক্তি পায় নি। সংস্কৃতানুসারী নদিয়া জেলার ভাষা এই সময় থেকে চরিত্রগত দিকে নানা পরিবর্তনের মুখোমুখি হলো। কথ্য ভাষা হিসেবে বাংলা প্রচলিত থাকলেও লেখার ভাষায় এবং রাজকার্যে বাংলার বদলে আসন জাঁকিয়ে বসলো 'পারস্যভাষা'। কিছুদিনের মধ্যেই আরো লক্ষ করা গেল, আমজনতার কথোপকথনে এবং লেখার কাজে পারসি ও হিন্দি শব্দের বহুল প্রয়োগ। বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে যুক্ত হল অজস্র আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ। 'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখেছেন,

"নবাব সংসার ও ফৌজদার প্রভৃতি সম্রাটের প্রধান কর্মচারীর
সহিত কথোপকথনে ও লিখনে পাঠনে, উর্দু ও পারস্য ব্যতীত
অন্য কোনো ভাষার ব্যবহার না থাকায়, রাজা ও তাঁহার
প্রধান কর্মচারীগণ বাল্যাবস্থায় ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন।"

নদিয়া জেলার ভাষায় এই যে মিশ্রণ ঘটে গেল একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ রাজভাষাকে অস্বীকার করার উপায় ও সাধ্য থাকা সম্ভবও নয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই মিশ্রিত ভাষাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রত্যয় জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন :

উচিত যে আরবী ফার্সী হিন্দুস্থানী।।
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।

তবে নদিয়া জেলার ভাষাগত মানচিত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তন লক্ষ করা গেল ইংরেজ আগমনের সময় থেকে। মোঘল শাসনের অধীনে যতদিন দেশ চলেছে তত দিন ভাষায় মিশ্রিত হয়েছিল আরবি, ফারসী ও উর্দুভাষা। রাজভাষার গঠনেও সেই প্রভাব বড়ো হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতানুসারী বাংলা ভাষার জায়গা দখল করেছিল 'যাবনীমিশাল' ভাষা। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ পদসঞ্চারে ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজভাষার খোলনল্‌চে দ্বিতীয়বার বদ্‌লানোর কাজ শুরু-হয়ে গেল। প্রস্তুতির দিন গুলিতে বাংলাকেই রাজভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হলো কিছু দিনের জন্য। অচিরকালের মধ্যেই রাজভাষা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হলো রাজকার্যের অলিতে গলিতে। তবে ভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠা পাবার প্রসঙ্গে 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় কার্তিকেয় চন্দ্র রায় মশাই বাংলার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে:

"যখন ১৮৩৭ খ্রিঃ অব্দের ২৯ বিধি অনুসারে, ১৮৩৮ অব্দে, বঙ্গ
দেশের জেলার বিচারালয়ে পারস্য ভাষার পরিবর্তে বঙ্গভাষা
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময় হইতে হিন্দু সমাজমধ্যে
পারস্য ভাষার অনুশীলন রহিত হইয়া গেল এবং মুসলমান দিগের
মধ্যেও ইহার আলোচনা ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আর
বঙ্গভাষার আলোচনা অধিক পরিমানে হইতে লাগিল।"

তবে এই পরিস্থিতির বিস্তৃতি সুদূর প্রসারী হয় নি। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বঙ্গভাষার স্থান দখল করে নিল ইংরেজি। বাংলাভাষার গঠনগত (ভিতর ও বাহির) পরিবর্তনের সূচনা ঘটল। এ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ রাজভাষার মর্যাদায় ইংরেজি যখন চড়ে বসেছে তখন আমজনতার কাছে সে ভাষার অনুসরণ করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে এবার বাংলা শব্দভান্ডার আবার ভরে উঠলো ইংরেজি শব্দে। লেখার কাজে, পড়ার কাজে এমন কি কথ্যরীতিতেও বাংলাভাষার সঙ্গে মিশলো ইংরেজি। আর ইতিমধ্যেই সেখানে মিশে আছে পারসি উর্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃত। নদিয়া জেলার ভাষা উনিশ শতকে এক মিশ্রভাষায় পরিণতিলাভ করলো, এই ইতিহাসটুকু স্মরণে রাখা আবশ্যক।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশশতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ভাষিক বৈশিষ্ট্যই টিকে ছিল নদিয়া জেলার সর্বত্র। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা গোটা দেশের অর্থনীতির উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব পড়লো এ জেলার ভাষার উপরেও। স্বাধীনতার সময় থেকে শুরু করে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য মানুষ চলে এলেন নদিয়া জেলায়। যেহেতু পূর্ববঙ্গের (এখনকার বাংলাদেশ) সন্নিহিত জেলা নদিয়া, সেকারণে উদ্বাস্তু আগমনের প্রবণতা নদিয়া জেলাতেই সবচাইতে বেশি ঘটেছে। ঔপভাষিক মৌলিকতা অনুসারে পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন বঙ্গালী উপভাষাগত অঞ্চলের মানুষ। এঁরা এসে পড়লেন রাঢ়ী উপভাষাগত এলাকায়। এখানে এসে রুটিরুজির কারণে স্থায়ী আবাস নিবাস গড়ে তুললেন নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। ফলে রাঢ়ী উপভাষার সঙ্গে বঙ্গালী উপভাষার একটা সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করল। ১৯৭০ থেকে শুরু করে অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাপকহারে উদ্বাস্তু আগমন ঘটল নদিয়া জেলায়। এবারের আগত অতিথিরা স্থান পেলেন নদিয়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ এসে ভীড় জমালেন সীমান্তবর্তী (ভারত-বাংলাদেশ) অঞ্চলগুলির কাছাকাছি। ধীরে ধীরে এরাও রুটিরুজি খুঁজে নিলেন এ জেলায়। বাসস্থান গড়ে তুললেন। বঙ্গালী উপভাষা এবার সবচাইতে বেশি প্রভাবিত করল রাঢ়ী উপভাষাকে। এইসব উদ্বাস্তু মানুষের সহজাত ভাষা বঙ্গালী। অথচ এদেশে আসার পর এরা রাঢ়ী উপভাষাকে অনুকরণ করতে চাইছেন। ফলে একটা অদ্ভুত ভাষাবৈশিষ্ট্য জন্ম নিতে শুরু করলো নদিয়া জেলার মাটিতে। একে বিভাষা বা প্রান্তিক ভাষা নামে চিহ্নিত করা হবে। এই বিভাষা বা প্রান্তিক ভাষা সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা আছে।

'নদিয়ার ভাষা' গ্রন্থটি প্রণয়নের একটি সংক্ষিপ্ত অতীত রয়েছে। যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম. ফিল গবেষণা পত্রটি নির্মাণ করতে গিয়ে নদিয়ার প্রান্তিক ভাষা সম্পর্কে প্রথম আমার কৌতূহল দানা বাঁধে। 'একটি বিভাষা সমীক্ষা: নদিয়া জেলা' শিরোনামে একটি প্রথাগত গবেষণাপত্র জমাও দিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ভাবনার ক্ষেত্র, যত দিন গেছে ততই বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। তথ্যসম্ভার পুঞ্জীভূত হয়েছে চেতনা ও মননে। তারই একটা সাধ্যমতো রূপ দেবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

বইটি লিখতে গিয়ে যাঁদের কাছে আমার ঋণ পর্বত প্রমাণ তাঁরা আমার জেলার প্রিয় জনতা। এ জেলার মাটিকে যেদিন প্রথম আমার শরীর ছুঁয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এ জেলার প্রতি আমার স্পর্শকাতরতা পূর্বাপর অটুট রয়েছে। নদিয়া জেলার সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সৌভাগ্য আমার জীবনের পরম ধন। তাই তাঁদের প্রতি আমার সবচাইতে বেশি ঋণ।

আমি ঋণী আমার সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুদের কাছে। আমার এ কাজে প্রথম যিনি সবচাইতে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি আজ লোকান্তরিত। প্রয়াত শচীনাথ মৈত্র। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য দূরত্ব বেড়ে গেলেও নতজানু হচ্ছি তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি। ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ সহধর্মিনী শ্রীমতী চৈতালী ভৌমিকের কাছে। কারণ আমার সংসার বিমুখতাকে প্রশ্রয় দিয়েও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েননি। মিত্রবিন্দা ও ঐশীপ্রমা—কন্যাদ্বয় বয়সোচিত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার কৃতজ্ঞতা 'পুনশ্চ' প্রকাশনীর কর্ণধার গবেষণানুরাগী, গ্রন্থকীট, সমাজসেবী মাননীয় শঙ্করী ভূষণ নায়ক মহাশয়ের কাছে। তাঁর পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখতে পেত না।

'নদিয়ার ভাষা' নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা কতটা ছিল সে বিচার পাঠক করবেন। আর গবেষক, ভাষা জিজ্ঞাসু, শিক্ষানুরাগী, পড়ুয়া বন্ধুদের কাছে এ গ্রন্থের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃতি পেলেই আমি খুশি।

বইমেলা ২০১২

দেবাশিস ভৌমিক
অধ্যাপক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
কালিয়াগঞ্জ কলেজ
উত্তর দিনাজপুর

সূচীপত্র

১. নজরবন্দী নদিয়া ১৩-২৭

১.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নদিয়াজেলা ১৩

১.২ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বাংলা ভাষাচর্চা ১৯

১.৩ নদিয়া জেলার ভৌগোলিক ছবি ২০

১.৪ নদিয়া জেলার জনবিন্যাস ২৩

১.৫ নদিয়া জেলার ভাষাসম্প্রদায় ২৫

২. নানামুখ নানা ভাষা ২৮-৪৯

২.১ নদিয়ার মুখ্যজনপদের ভাষা ২৮

২.২ নদিয়ার মুখ্য জনপদের ভাষাবৈশিষ্ট্য ৩৩

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৩

(খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৫

(গ) মুখ্যজন- পদভাষায় শব্দভান্ডার ৩৬

২.৩ নদিয়ার কথ্যভাষায় বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ প্রবচন ৪৬

৩. বাংলাসাহিত্যে অনুসৃত নদিয়ার ভাষা ৫০-৬৩

৩.১ নদিয়ার কথ্যভাষা বনাম লেখ্যভাষা
প্রমথ চৌধুরী ও নদিয়ার কথ্যভাষা ৫০

৩.২ আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যে নদিয়ার কথ্যভাষা ৫৪

৩.৩ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে নদিয়ার বিভাষা ৫৭

৩.৪ নদিয়ার স্থাননাম নিয়ে প্রচলিত ছড়া ও
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ৬১

৪. বিভাষা সমীক্ষা : নদিয়া জেলা ৬৪-১১৮

৪.১ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষা তথা বিভাষা ৬৪

৪.২ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৭০
৪.৩ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ৯০
৪.৪ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্য ১১১
৫. নদিয়ার বিভাষা ও তার বিস্তারভূমি ১১৯-১৪০
৫.১ পরিপ্রেক্ষিত সমাজভাষা : নদিয়া জেলা ১১৯
৫.২ নদিয়ার স্থাননাম উচ্চারণে বিভাষার প্রভাব ১২৭
৫.৩ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় শব্দভান্ডার ১৩১
৫.৪ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় উচ্চারিত মাসের নাম ও বারের নাম ১৩৭
৫.৫ নদিয়ার প্রান্তিক ভাষায় প্রচলিত বাগ্‌ধারা, প্রবাদ, প্রবচন ১৩৮
শেষকথা ১৪১
গ্রন্থপঞ্জি ১৪৩

১. নজরবন্দী নদিয়া

১.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নদিয়া জেলা

কোনো একটা উৎস থেকে যদি নদিয়া জেলার ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করতে হয়, তবে তা অবশ্যই রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকে শুরু করতে হবে। ইতিহাস বলছে, রাজা শশাঙ্ক বঙ্গদেশের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন গৌড়ে, ৬০৩ খ্রিস্টাব্দে। মোট ষোলবছর অর্থাৎ ৬০৩ থেকে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের দায়িত্বভার তিনি সামলেছেন দক্ষ হাতে। অত দক্ষ এবং প্রজাবৎসল রাজার মৃত্যুর পর চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যায় দেশ জুড়ে। অবশ্য শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সেই মাৎসন্যায় দমনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন গোপাল নামে পাল বংশীয় প্রথম রাজা। গোপাল থেকে শুরু করে পালবংশ এবং তার পরবর্তী কালে সেনবংশ দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতা ভোগ করে। সেনবংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন রাজা হন ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে। রাজধানী 'গৌড়' এর নাম পরিবর্তন করে তিনি নিজের নামানুসারে রাজধানীর নামায়ন করেন 'লক্ষ্মাবতী'। উল্লেখ করা প্রয়োজন 'নবদ্বীপ' ছিল লক্ষ্ম সেনের অস্থায়ী রাজধানী। ঐতিহাসিকদের মত হল আগে নদিয়া বলতে বোঝাত শুধু নবদ্বীপকেই।

১২০২ এর তুর্কি আক্রমণ সারা বাংলার মতো নদিয়া জেলাকেও বিলোড়িত করে তুলল প্রশাসনিক, আর্থসামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে। তুর্কি জায়গীরদার মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি নদিয়া দখল করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে এটি মুসলমান অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হল। ঐতিহাসিকের অনুমান, মাত্র আঠেরোজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ খিলজি নদিয়ায় ঢোকেন। সাধারণ নাগরিকেরা ভেবেছিল এরা হয়ত ঘোড়া বিক্রি করবার জন্য এখানে এসেছে। আসলে এই আঠেরো জন ঘোড়সওয়ার নাগরিকদের উপর এতটুকু অত্যাচার করে নি। তারা রাস্তার ধারে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল এবং নিজেদের মধ্যে নানা খোসগল্পে ব্যস্ত ছিল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব অশ্বারোহী সৈন্য রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি চলে এল। সেই সময় রাজা

লক্ষণ সেন দ্বিপ্রাহরিক আহারে ব্যস্ত। অশ্বারোহী সৈন্যরা খোলা তরবারি নিয়ে রাজপ্রাসাদে অতর্কিতে ঢুকে পড়লে লক্ষণ সেন প্রমাদ গণলেন এবং পিছনের দরজা দিয়ে প্রাসাদের বাইরে পালিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সেই অশ্বারোহী সৈন্যদের একটা অংশ রাজধানীর দখল নিয়ে নিল। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নদিয়ার রাজধানী 'লক্ষ্মাবতী' থাকলেও পরবর্তীকালে এটি ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের দখলে চলে যায়।

১৪৯৩-এর আগে পর্যন্ত নদিয়ার ঐতিহাসিক চালচিত্র কিছুটা অজ্ঞাত আর কিছুটা অনুমান নির্ভর। হুসেন শাহ শাসনকর্তা হবার পর নদিয়ায় ধর্মীয় সংস্কারের কিছুটা অগ্রগতি হয়। হুসেন শাহর সময়ে এই জেলার নানা ভগ্ন মন্দির সংস্কার করা হয়। হুসেন শাহ কয়েকজন কাজিকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই নদিয়াজেলায় নিয়ে আসেন। এরাই নদিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। কয়েকজনের নাম জানা যায়—চাঁদ খাঁ কাজী, মুলুককাজী প্রমুখ। নবদ্বীপের কাছে বামনপুকুর অঞ্চলে থাকতেন চাঁদ খাঁ কাজী। মায়াপুর যাবার পথে এই চাঁদ খাঁ কাজীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও চোখে পড়ে। মুলুক কাজীর নিবাস ছিল শান্তিপুরে। চৈতন্য জীবনীকারেরা মনে করেন চাঁদ খাঁ কাজী প্রথম দিকে চৈতন্যদেবের ধর্মীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেন। চাঁদ কাজীর মতো যবন হরিদাসও পরম বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন।

হুসেন শাহর আমলে নদিয়া জেলায় শুধু যে ধর্মীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তাই নয়। এই সময়েই এ জেলার বিদ্যাচর্চারও প্রসার ঘটে। শিক্ষা সংস্কৃতিচর্চার মূলকেন্দ্র হয়ে ওঠে নবদ্বীপ তথা নদিয়া। হুসেন শাহর আমলে গোটা রাজ্যের ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিরা হোসেন শাহর কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যও সেই সময় অনেকটাই উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আসলে হুসেন শাহের সবচাইতে বড়ো গুণ ছিল পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং উদারতা। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মআন্দোলনের ক্ষেত্রে হুসেন শাহকে পাশে পেয়েছিলেন বলেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম এত দ্রুত জনমানসে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতির আদান প্রদানের বিষয়টিও হুসেন শাহের আমল থেকেই প্রচলিত হয়। হুশেন শাহ উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কৃষ্টি নির্মাণের জন্য সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলন করেন। হিন্দুরা পীরের দরজায় যেমন মানত করতেন তেমনি সত্যনারায়ণের পূজার সিন্নি প্রসাদ এর নেমন্তন্ন থাকতো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের। তারা নির্দ্বিধায় সত্যনারায়ণের প্রসাদ খেতেন। এমন কি, সত্যপীরের থানেও হিন্দুরা সিন্নি মানত করতেন। এই সত্যপীর ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের আরাধ্য। নদিয়াজেলার এই ধর্মীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শন গোটা বাংলা তথা ভারতবর্ষের কাছে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহের দেহান্ত ঘটে। এরপর বাংলার সুলতান হলেন

নসরৎ শাহ। ইনি হুসেন শাহের পুত্র। নসরৎ শাহও পিতার মতোই শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। পিতার মতোই তিনিও শিল্প-সাহিত্যের যথার্থ সমজদার ছিলেন। হুসেন শাহী বংশের অবসান ঘটল গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। পাঠান সুলতান শের খাঁ শূর গিয়াসুদ্দিন শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে বঙ্গ দেশের দখল নিয়ে নেন। শূর বংশও খুব বেশি দিন শাসন ভার ধরে রাখতে পারে নি। শূর বংশের পতনের পর ক্ষমতায় এসেছিল করবানী বংশ। সুলতান সুলেমান খাঁ করবানী তার সেনাপতিকে দিয়ে আসাম ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং বহু মন্দির ও দেব দেউল ধ্বংস করেন। এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন দাউদ খাঁ, ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর এই দাউদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে গোটা বঙ্গদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আরেকটি ঐতিহাসিক তথ্য হল তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নিজের শাসন কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশকে তিনটি বিভাগে বিন্যস্ত করে নেন। সেগুলি হলো, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ। প্রতিটি ভাগের জন্য একটি করে রাজধানী স্থাপন করা হয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জন্য লক্ষণাবতী, পূর্ববঙ্গের জন্য সোনার গাঁ এবং দক্ষিণবঙ্গের জন্য সপ্তগ্রাম। সেইসময়ে নদিয়া হয়ে গিয়েছিল সপ্তগ্রামএর অন্তর্ভুক্ত।

যাইহোক, মোগল সম্রাট আকবরের আমলে তাঁর রাজস্ব সচিব টোডরমল বঙ্গদেশে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে জমি জরিপ করবার সময় গোটা বঙ্গদেশকে মোট ১৯ টি সরকারে এবং ৬৮২ টি মহালে ভাগ করে নেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, শের শাহের আমলে (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি :) বঙ্গদেশকে ইতিমধ্যেই ১৯ টি সরকারে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 'সরকার' এবং 'মহাল' শব্দ দুটি তুলে দিলেন। তার পরিবর্তে তিনি নাম দিলেন যথাক্রমে 'চাকলা' এবং 'পরগণা'। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই রাজধানীর নাম হল মুর্শিদাবাদ।

এই রকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নদিয়া জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রেও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল। যশোরের হিন্দুরাজা প্রতাপাদিত্য সেইসময় (১৫৮৪-১৬০৬ খ্রি :) নিজের ক্ষমতা বিস্তারের নেশায় মত্ত। সে খবর দিল্লিতে বসেই পেলেন সম্রাট। তিনি এই প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য সেনাপতি মানসিংহকে পাঠালেন বাংলায়। তার সঙ্গে এল কয়েকশো মোগল সেনা। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের জমিদার ছিলেন ভবানন্দ মজুমদার। তিনি মানসিংহকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাতে করে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করা যায়। কারণ প্রতাপাদিত্য এই ভবানন্দমজুমদারের জমিদারি কেড়ে নেবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। মানসিংহের পক্ষে কাজটা অনেকসহজ হয়ে গেল। তিনি বিক্রমশালী

প্রতাপাদিত্যকে সহজেই যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের লেখা 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থে এই ইতিহাসটুকু ধরা রয়েছে।

এরপর মোগল শাসন খুব শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হল নদিয়া জেলায়। প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার জন্য ভবানন্দ মজুমদার সেনাপতি মানসিংহকে সাহায্য করেছেন—এই সংবাদ কানে গেল সম্রাট জাহাঙ্গীরের। তিনি ভবানন্দ মজুমদারের উপর ভীষণ খুশি হলেন এবং ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাকে ১৪ টি পরগণা দান করলেন। শুধু তাই নয়, ভবানন্দ মজুমদার এবং তার বংশধরেরা সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধিও লাভ করেছিলেন সেই সূত্রে।

ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম ছিল দুর্গাদাস সমাদ্দার। নদিয়ার রাজা হবার পর তাঁর নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার। ভবানন্দ নদিয়া শাসন করেছেন ১৬০৬ থেকে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর অবশ্য নদিয়ার রাজারা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। উপাধি না বলে বরং বলা ভালো যে তারা 'রায়' খেতাব অর্জন করেছিলেন। ভবানন্দ মজুমদার নদিয়ার রাজা হয়ে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ভবানন্দের পুত্র গোপালএর রাজত্বকাল ১৬২৮-১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। গোপালের পুত্র রাঘব রায় রাজত্ব করেন ১৬৩২ থেকে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজা রাঘব রায়ের আমলে শ্রীনগরে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়।

রাঘব রায়ের পুত্র ছিলেন রুদ্র রায়। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮৩ থেকে ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নদিয়ার রাজা রুদ্র রায় নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরের মাঝামাঝি এক জায়গায় 'রেউই' নামক একটি অখ্যাত গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুসারে তিনি এই অঞ্চলের নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর।

রুদ্র রায়ের প্রথমা রানীর পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র এবং রামজীবন। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য রাজা হন রামচন্দ্র। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই কৃষ্ণনগরের রাজা হিসেবে মনোনীত হলেন রামজীবন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬৯৪ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রামজীবনের আমলে কৃষ্ণনগর শিক্ষা ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এই রামজীবনের ছিল তিন রানী। কিন্তু রামজীবনের পর কৃষ্ণনগরের রাজা হন দ্বিতীয়া রানির পুত্র রঘুরাম। রঘুরামের রাজত্বকাল ১৭১৫ থেকে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই রঘুরাম রায়ের পুত্র হলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নদিয়ার শ্রেষ্ঠতম রাজা। তাঁর কথা আলাদাভাবে ইতিহাসের জন্য বরাদ্দ করে রাখতে চেয়েছেন ইতিহাসকারেরা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের ব্যাপ্তি ছিল সুবৃহৎ। ১৭২৮ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। শুধু রাজত্বকালের ব্যাপ্তিই নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রাজ্যেরও প্রসার ঘটে দীর্ঘতর। তাঁর রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল ৮৪ টি পরগণায়। রাজ্যের পরিধি ছিল ৩৮৫০ বর্গক্রোশ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে নদিয়া জেলার প্রথম কালেক্টার হয়েছিলেন রেডফন্ট সাহেব। বিচিত্র ঘটনাবহুল ছিল এই রাজার রাজত্বকাল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পলাশীর যুদ্ধ, বর্গীর হাঙ্গামা, আধুনিক যুগের সূত্রপাত—কী ছিল না এই রাজার রাজত্বকালের ইতিহাসে! তবে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বর্গীর অত্যাচার। এদের হামলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সবচাইতে বেশি অশান্তির মধ্যে ফেলেছিল। উপায়ান্তর না দেখে রাজা তাঁর রাজধানীটিও স্থানান্তরিত করেন কৃষ্ণনগর থেকে। কৃষ্ণনগরের অদূরে চুর্নী নদীর তীরে শিবনিবাস নামক একটি নির্জন এলাকায় তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মহারাজেন্দ্রবাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রকে 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তাঁর সময়কালে তিনি ছিলেন বাংলার সবচাইতে বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনস্ক রাজা। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ এবং কুশদ্বীপ— সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এই চারটি অঞ্চলে যে সুশীল বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠেছিল, কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তার সমাজপতি। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, গোপাল ভাঁড় প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ও হাস্যরসিক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামোহন গোস্বামী প্রমুখ গুণীজনদের সম্মান জানাবার জন্য তিনি নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছেতেই ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। নাটোর থেকে তিনি কয়েকজন সুদক্ষ মৃৎশিল্পীকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ক্লাইভ কর্তৃক তিনি 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া রানীর পুত্র শিবচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা হন। শিবচন্দ্রের রাজত্বকাল ছিল ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর পর আসেন শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র রাজদায়িত্ব পালন করেছিলেন ১৭৮৮ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র রাজত্ব করেন দীর্ঘকাল। ১৮০২ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজা গিরিশচন্দ্রের কোনো পুত্রসন্তান না থাকার কারণে তিনি শ্রীশচন্দ্রকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৮৪২ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজা শ্রীশ চন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্রও ছিলেন পুত্রহীন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যভার সামলাবার পর তিনি রাজপদে অব্যাহতি নেন এবং তার মৃত্যু হয়। সতীশচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহীষী ভুবনেশ্বরী দেবী ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। পুরোনো নথিপত্র থেকে জানা যায় ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোর্ট অব অর্ডার্সের অধীনে থাকে নদিয়ারাজ-এস্টেট। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন ক্ষিতীশচন্দ্র। ক্ষিতিশচন্দ্র রাজত্ব করেন ১৮৯০ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।